2.7 ভূগোলের ধ্রুপদী পর্যায় (The Classical Period in Geography)

উনবিংশ শতাব্দীর ভূগোলকে **ধ্রুপদী** (classical) আখ্যা দেওয়া হয়। এসময়ে ভূবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন ঘটেছিল। এই **বৈজ্ঞানিক ভূগোলের** (scientific geography) রীতি পদ্ধতিগুলি ছিল একই ধরনের ও জটিলতামুক্ত। এজন্যেই এযুগের ভূগোলকে 'ধ্রুপদী' আখ্যা দেন মার্কিন ভৌগোলিক **হার্টশোর্ন** (Hartshorne, 1939)।

ধ্রুপদী ভূগোলের সূচনা হয়েছিল **জার্মানিতে**। দুজন জার্মান পণ্ডিত ছিলেন এই পর্যায়ের সর্বপ্রধান ভৌগোলিক। এঁরা হলেন **আলেকজাণ্ডার ফন্ হুমবোল্ট** (Alexander Von Humboldt, 1769-1859) এবং **কার্ল রিটার** (Carl Ritter, 1779-1859)। সমকালীন ও সমদৈশিক এই দুজন পণ্ডিতের কাছে আধুনিক ভূগোলের ঋণের শেষ নেই। তাই **হুমবোল্ট ও রিটারকে** 'আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা' (founders of modern geography) বলা হয়।

হুমবোল্ট ও রিটার—আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা

হুমবোল্ট ও রিটার, দুজনেরই বিশ্বাস ছিল **নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত চোখে দেখা সত্যের ওপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হতে হবে** (science must be founded on the objective description of observed facts), বুদ্ধিদ্বারা নির্ণীত বিচারের ওপরে নয়। সুতরাং ভৌগোলিকের কাজ হল **অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্য আরোহণ করা এবং তার মধ্যে থেকে মিল ও নিয়ম খুঁজে বের করা**। পূর্বসূরীদের সঞ্চিত তথ্য নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে দুজনেই তাঁদের নিজস্ব, অননুকরণীয় ভঙ্গিতে **ভূগোলকে এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে জগতে প্রতিষ্ঠা দেন**। তাঁদের ভাবনাচিন্তায় **বেশ কিছু মিল** রয়েছে। বিশেষ করে ভৌগোলিক তথ্য এলোমেলোভাবে ব্যবহারের জন্য দুজনেই তাঁদের **পূর্বতন পণ্ডিতদের সমালোচনা করেছিলেন তীব্র ভাষায়**। তাঁদের **পাঠ-পদ্ধতি** (scheme of study) ছিল একইরকম : ভৌগোলিক বিচার শুরু হবে কোনও স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা দিয়ে, তারপরে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য মানবীয় দিকগুলির বর্ণনা করতে হবে। এই নতুন বিধিতন্ত্র অন্যান্য জার্মান ভৌগোলিকেরা গ্রহণ করেছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় আগাগোড়াই এই পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এই পদ্ধতির অঙ্গ হল **পরিবেশের জৈব ও অজৈব বিষয়গুলির মধ্যে অর্থপূর্ণ সম্বন্ধ খুঁজে বের করা**। ফলে ধ্রুপদী ভূগোলের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল **প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে তাদের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে** (natural context) **রেখে তাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধ** বোঝার চেষ্টা করা।

হুমবোল্ট ও রিটারের অবদান

হুমবোল্ট ও রিটারের চিন্তাধারার মিল কিন্তু আকস্মিক নয়। দুজনের মধ্যে স্বভাব ও চরিত্রের অনেক তফাৎ-ও ছিল। **হুমবোল্ট** ছিলেন বিশ্ব-পর্যটক এক বহুমুখী প্রতিভা। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ভৌগোলিক সিদ্ধান্তে

পৌঁছাতেন। অপরপক্ষে **রিটার** ছিলেন মূলত ঐতিহাসিক, যাঁকে (ব্যঙ্গ করে) বলা হয় 'আরামকেদারায় বসা ভৌগোলিক' ('armchair geographer')। **হুমবোল্টের** সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তার ভিত্তিতে গবেষণা করতেন বলে রিটার নিজেকে হুমবোল্টের শিষ্য হিসেবে গণ্য করতেন। অবশ্য হুমবোল্টের চোখে তিনি ছিলেন 'পুরনো বন্ধু' (old friend)। দুজনেরই মৃত্যু হয় 1859 সালে, **স্যার চার্লস ডারউইনের** সাড়া জাগানো বই *অরিজিন অফ স্পিসিস* (*The Origin of Species*) গ্রন্থটি প্রকাশের বছরে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভূগোলে কোনওরকম প্রভাব ফেলতে পারার আগেই দুজনের ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভৌগোলিক অভিযান ও মানচিত্রায়নের যে বিপুল বিস্তার ঘটে তা **হুমবোল্ট** ও **রিটারের** চিন্তাধারায় ধরা পড়েনি।

হুমবোল্ট ও রিটারের চিন্তা ও পার্থক্য

আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট ছিলেন নানা বিজ্ঞানে পারদর্শী এক বহুমুখী প্রতিভা। বিশ্বজগতের জটিল তন্তু সম্যকভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে **হুমবোল্ট** তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন পৃথিবী ভ্রমণে। 1769 সালে বার্লিনে তাঁর জন্ম হয় উচ্চকুলে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অবশ্য মাত্র ছ'মাস পরেই তিনি গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে ও ফ্রাইবার্গ-এ শিক্ষালাভের পর বেশ কিছুদিন খনন ভূতাত্ত্বিক (*mining geologist*) হিসাবে কাজ করতে থাকেন। 1790 সাল থেকেই তিনি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভ্রমণ শুরু করেন। খনিতে কর্মরত থাকাকালীনও তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের অনুসন্ধিৎসা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। জার্মান কবি *গ্যেটের* (*Goethe*) সঙ্গে হুমবোল্টের বন্ধুত্বও তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয়। দার্শনিক *হেগেলের* (*Hegel*) চিন্তাধারার সঙ্গেও তিনি একমত হন যে সমস্ত পৃথিবী হল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অংশ নিয়ে তৈরি একটি অবিচ্ছেদ্য অখণ্ড সমগ্র। এই সুসম্বদ্ধ ঐক্যের ধারণা তাঁর প্রতিটি রচনায় স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সে তিনি ফরাসি ভৌগোলিক **লাপ্লেস** (*Laplace*)-এর কাছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা করেন।

তাঁর মাতার পরলোকগমনের পর, 1799 সালের জুন মাসে **হুমবোল্ট** ফরাসি উদ্ভিদবিদ **এম বঁপ্লাঁ-র** (*Aime Bonpland*) সঙ্গে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হুমবোল্টের ভ্রমণ ও ভৌগোলিক অন্বেষণ

বর্তমানে যেখানে ভেনেজুয়েলা দেশ অবস্থিত, তখনকার 'কুমানা' নামে পরিচিত সেই স্থানে অবতরণ করে তিনি কারাকাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর কয়েক বছর পর্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে **হুমবোল্ট** ভ্রমণ করতে থাকেন—আন্দিজ পর্বত, ওরিনোকো নদীর উৎস ও আমাজনের সঙ্গে তার সংযোগ আবিষ্কার করে কিউবা-মেক্সিকো হয়ে তিনি শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান। সেখানে ফিলাডেলফিয়া ও ওয়াশিংটন ভ্রমণের পরে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ফিরে আসেন 1804 সালে।

এর পরের কুড়ি বছর **হুমবোল্ট** প্রধানত কাটিয়েছিলেন ফ্রান্সের রাজধানী

প্যারিসে। 'নতুন মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহে যাত্রা' রচনায় তাঁর আমেরিকায় লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। মধ্য আমেরিকার পানামা যোজককে একটি খাল খনন করা উচিত বলে মত দিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া নতুন স্পেনের (অর্থাৎ বর্তমানের মেক্সিকো) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতির বিষয়েও তাঁর বক্তব্য ছিল আশাবাদী। 1829 সালে রাশিয়ার জারের আমন্ত্রণে **হুমবোল্ট** সাইবেরিয়া ও আলতাই পর্বত অঞ্চলে যাত্রা করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা 'এশিয়া সেন্ট্রাল' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 1830 সালে ফিরে জীবনের শেষ 29 বছর তিনি জার্মানির বার্লিন শহরেই অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি রাজকীয় সম্মান পান। আজ পর্যন্ত জার্মানির সর্বোচ্চ বৃত্তি **হুমবোল্টের** নামে চিহ্নিত।

হিসাব করে দেখা গেছে তাঁর জীবনকালে **হুমবোল্ট** প্রায় নব্বই হাজার কিলোমিটার যাত্রা করেছেন এবং প্রায় চল্লিশটি বই লিখেছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাতেই **প্রকৃতির ঐক্য** (unity of nature) ও **কার্যকারণত্ব** (cause and effect)—এই দুটি মূল সুর। তবে **হুমবোল্টের** সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ **'কসমস'** (Kosmos)। এই বই-তে সমস্ত পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে; তার সব তথ্যই হুমবোল্টের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশিত ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থের সাহায্য নিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। 1845 থেকে 1862, অর্থাৎ মোট 17 বছর লেগেছিল পাঁচখণ্ডের গ্রন্থ **'কসমস'** প্রকাশে।

হুমবোল্টের প্রধান রচনা সমূহ

হুমবোল্টের মতে ভূগোল হল 'প্রাণময় ভূবিশ্বের ছন্দোময় সামগ্রিক ঐক্যকে বোঝার উপায়' ('the means of comprehending the harmonious unity of the cosmos as a living whole')। ভৌগোলিক অনুসন্ধান তাঁর মতে কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ নয়; সমস্ত জগৎকে নিয়েই গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান। **কান্টের** ভূগোল-চিন্তা **হুমবোল্টকে** প্রভাবিত করেছিল, এবং এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'কসমস' গ্রন্থে। তাঁর মতে প্রকৃতির এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধের জন্য। মানুষ এবং প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ যেমন প্রকৃতির অঙ্গ, তেমনি অজৈব বস্তু ও পদার্থগুলিও এই ঐক্যের অংশীদার।

ভৌগোলিক ধারণা

পদ্ধতিগত দিক থেকেও **হুমবোল্টের** ভৌগোলিক অবদান ছিল অনন্য। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে, **পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে**, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই ছিল তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক বিচার পদ্ধতি। **অর্থাৎ কান্টীয় অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক** ছিলেন তিনি। তাঁর মতে তথ্য ছাড়া কেবল যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে প্রাপ্ত শুদ্ধজ্ঞান ও তত্ত্ব টেঁকে না। অবশ্য **কান্টের** অনুগামী ছিলেন তাই **হুমবোল্ট** বিশুদ্ধ যুক্তিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেননি। তবে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যকে বাদ দিয়ে যে যুক্তি সম্পূর্ণ হয় না, সে বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মত ছিল। অর্থাৎ আরোহী (inductive) **যুক্তিপদ্ধতি, এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ তত্ত্বে পৌঁছানোতে বিশ্বাসী ছিলেন হুমবোল্ট।**

পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবাধ চলাচলকারী (polymath) মহান পণ্ডিতদের সর্বশেষ ছিলেন **হুমবোল্ট**। ভূগোলকে এক পৃথক, আদি বিজ্ঞানে পরিণত করেছিলেন তিনি। বহুমুখী প্রতিভা, তীক্ষ্ণবিচার বিশ্লেষণী শক্তি, তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা প্রেক্ষণ, সম্পূর্ণ শুদ্ধতা ও মানচিত্র অঙ্কনের দ্বারা তিনি **ভূগোলকে এক প্রণালীবদ্ধ** (systematic) **বিজ্ঞানে পরিণত করেছিলেন।**

হুমবোল্টের ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে **সাতটি বিষয়** উল্লেখযোগ্য :

কার্ল রিটার (*Carl Ritter*) ছিলেন হুমবোল্টের সমসাময়িক অপর এক জার্মান পণ্ডিত যাঁর অবদান আধুনিক ভূগোলে অপরিমেয়। এমনকি কেউ কেউ একথাও মনে করেন যে জার্মানিতে ভূগোলের বৃদ্ধি ও বিকাশে **হুমবোল্টের** চেয়ে **রিটারের** প্রত্যক্ষ প্রভাবই বেশি ছিল।

1779 সালে **রিটার** জন্মগ্রহণ করেন মোটামুটি অবস্থাপন্ন এক পরিবারে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাকালেই মানুষ ও পরিবেশের নিবিড় সম্পর্কের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক অবস্থার অবনতি সত্ত্বেও এমন এক স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভ হয় যেখানে প্রকৃতির পাঠে রুচি জাগানো হত। এই স্কুলে ক্রিয়াত্মক নিয়মে ও নানা স্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে ছাত্রদের ভেতরের সম্ভাবনাগুলিকে গড়ে তোলা হত এবং তার মধ্যে পর্যবেক্ষণের কৌতূহল সৃষ্টি করা হত। প্রায় সতেরো বছর বয়সে **রিটার** হেলে (Helle) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন প্রধানত গণিত, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের এক ধনীগৃহে গৃহশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং দেশবিদেশে ভ্রমণ শুরু করেন। ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডে ভ্রমণের সময়েই তিনি এক বিস্তৃত বিষয়ের উপর গবেষণা শুরু করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের পর তিনি এই মহাদেশের ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে পুস্তক ও কিছু মানচিত্র প্রকাশ করেন।

রিটারের জীবন

রিটার তাঁর জীবনে বহু খ্যাতনামা মনীষীর সান্নিধ্যে আসেন, কিন্তু 1807 সালে **ফন হুমবোল্টের** সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার তাৎপর্য গভীর। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্যের গুরুত্ব মানুষের কাছে যে কি গভীর তা অনুভবের মাধ্যমে **রিটারের** পাণ্ডিত্যের গতিধারা বদলে যায়। 1819 সালে **রিটার** ফ্রাঙ্কফুর্টের জিমনেশিয়ামে (gymnasium) ইতিহাস-ভূগোলের প্রফেসর নিযুক্ত হন। এর একবছর পরে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের সর্বপ্রথম প্রফেসর নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত (1859 সাল) অধ্যাপনা করেছিলেন। **হুমবোল্টের** তুলনায় **রিটার** বহু দূর দেশের দীর্ঘ সফর কমই করেছেন, তবে তা এত কম নয় যে তাঁকে 'আরামকেদারায় বসা ভৌগোলিক' বলা চলে।

তাঁর জীবৎকালে **কার্ল রিটার** অজস্র গ্রন্থ রচনা ও মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর প্রথমদিকের রচনা হল ইউরোপ বিষয়ে দুই খণ্ডের একটি গ্রন্থ—'Europe : A Geographical, Historical and Statistical Painting'। এই দুটি খণ্ড যথাক্রমে 1804 ও 1807 সালে প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গেই 1806 সালে ইউরোপের ছয়টি মানচিত্র

প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি 1811 সালে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পৃথিবীর ভূগোলের বর্ণনা রচনা করেন, কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়নি। 1817 সালে প্রকাশিত হয় **রিটারের** সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ **আরডকুণ্ডে** (Erdkunde)-এর প্রথম খণ্ড আফ্রিকা মহাদেশের বিষয়ে। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে এশিয়া মহাদেশের বর্ণনা আছে। এই খণ্ডটি প্রকাশিত হয় পরের বছর। প্রধানত এই গ্রন্থটির জন্যই তাঁকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় 1820 সালে। এর পর 1859 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত **রিটার** 'আরডকুণ্ডে' গ্রন্থের **উনিশটি খণ্ড** প্রকাশিত করেন।

হুমবোল্ট ছিলেন বয়সে **রিটারের** চেয়ে দশ বছরের বড়। স্বভাবতই **রিটারের চিন্তাধারায় হুমবোল্টের প্রভাব খুবই বেশি**। অথচ **হুমবোল্টের** সঙ্গে দেখা হবার পূর্বেই **রিটার** স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিচারধারা গঠন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দুজনের চিন্তাধারায় **মিল থাকা সত্ত্বেও প্রচুর পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। রিটারের মতে ভৌগোলিক বিভিন্নতা থেকেই ঐতিহাসিক বিভিন্নতা উৎপন্ন হয়** (historical diversity is a result of geographical diversity)। ভূগোলে এই দৃষ্টিভঙ্গিই জন্ম দেয় **নিয়ন্ত্রণবাদের** (determinism)। **রিটারের** যে কোনও একখানি গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর মনীষার পূর্ণ পরিচয় মেলা কঠিন, কারণ তাঁর জীবনে ক্রমশই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে, পরিণত রূপ নিয়ে তাঁর মতামতগুলি গড়ে উঠেছে। বিস্তৃত যুক্তিজালের মাধ্যমে **রিটার** দেখিয়েছেন কোনও স্থানের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণীকুল ও মানুষের মধ্যে কি রূপে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিরাজ করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত স্থলভাগের এক সজীব বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, যার মাধ্যমে ভূগোল এক নতুন, বৈজ্ঞানিক রূপ নেবে। 'দৈশিক সম্বন্ধের' (relationship in space) ধারণাও গড়ে তোলেন **রিটার**। তাঁর মতে পৃথিবী ও তার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এক **পারস্পরিক সম্বন্ধ** রয়েছে। এই সম্বন্ধের মধ্য থেকেই ফুটে ওঠে মানব-সৃষ্টিকর্তার এক দৈবী উদ্দেশ্য। **রিটার** মনে করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। এই দৈবী ইচ্ছার ফলেই পৃথিবী মানুষের শিক্ষণ-ভূমি ও পোষণ-ভূমি। বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান, সেখানকার ভূমিরূপ—এসকলই এক নিয়ম মেনে ঘটেছে। এই নিয়মের ব্যাখ্যা, **রিটারের** মতে, রয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। রিটারের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পরমকারণবাদ (teleological view) বলা হয়। এখানেও **হুমবোল্ট** এবং **রিটারের** চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

রিটারের চিন্তা পদ্ধতি

রিটারের পরমকারণবাদ

ভূগোল **অধ্যয়ন-পদ্ধতি** সম্পর্কেও রিটারের মতামত ছিল স্পষ্ট। তাঁর মতে একমাত্র অনুভবের মাধ্যমে, **অভিজ্ঞতার মাধ্যমে** (empirically) ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। অতি যত্নসহকারে নিরীক্ষণ (observation) এবং প্রেক্ষণজাত জ্ঞানকে একত্রিত করে সত্যের অনুসন্ধান—এই ছিল রিটারের বিধি। কার্যকারণ-সম্বন্ধকে গভীরভাবে বুঝতে গিয়ে রিটার ব্যবহার করেন **তুলনাত্মক পদ্ধতি** (comparative method)। আবার ছোট ছোট আঞ্চলিক বিভাগগুলির ব্যক্তিত্ব জানার পরে পূর্ণরূপে তাদের **সামগ্রিক বর্ণনা** করেছেন রিটার। এছাড়া তাঁর রচনায় রয়েছে **বিশ্লেষণ** ও

সংশ্লেষণ (analysis and synthesis) এবং শেষে **সাধারণীকরণ** (generalization) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার। এছাড়া ভৌগোলিক আলোচনায় **মানচিত্রের** গুরুত্ব স্বীকার করেছেন তিনি।

রিটার ও **হুমবোল্টের** গবেষণার প্রধান মিল হল :

1. **প্রকৃতির ঐক্যে** বিশ্বাস (unity of nature) ;
2. **কার্যকারণ-সম্বন্ধ** (cause and effect relation) ;
3. **মানবকেন্দ্রিকতা** (anthropocentrism) ; এবং
4. **অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি** (empirical approach)।

অনেক পণ্ডিতের মতে **হুমবোল্ট** ও **রিটার** ছিলেন **পরস্পরের পরিপূরক** (complementary) ; হুমবোল্ট যেখানে প্রাণালীবদ্ধ ভূগোলের (systematic geography) পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, রিটার সেখানে আঞ্চলিক ভূগোলের (regional geography) আলোচনা করেছেন। এই দুজনের চিন্তাধারার মিলনের ফলে ভূগোল পরিণত হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পৃথক বিজ্ঞানে।

হুমবোল্ট ও **রিটার** দুজনেই মারা যান **1859 সালে**। সে বছরেই **ডারউইনের** লেখা **জাতিবর্গের উৎপত্তি বিষয়ক** বিখ্যাত গ্রন্থটি ('Origin of Species') প্রকাশিত হয়। এই দুজনের মৃত্যুর ফলে ভূগোলের বিকাশে এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে **আদর্শবাদের** (idealism) প্রাধান্য ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মাথা চাড়া নিয়ে ওঠে **বস্তুবাদ** (materialism)। বিজ্ঞান ও দর্শনে শুরু হয় নতুন এক ওলোটপালোট। ভূগোলেও এই আন্দোলনের তরঙ্গ প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

ধ্রুপদী ভূগোলের অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা হলেন **ফ্রোবেল** (Frobel, 1805-1893) ও **পেশেল** (Peschel, 1826-1875)। সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও রিটারের পরমকারণবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন **ফ্রোবেল**। তাঁর মতে ভূগোল এক **বিধিবদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (systematic natural science)। তিনি **তুলনাত্মক পদ্ধতির**ও স্পষ্টীকরণ করেছিলেন। তাঁর মতে একটি পর্বতের সঙ্গে অন্য একটি পর্বতের, একটি নদীর সঙ্গে অপর একটি নদীর তুলনা করা চলে। কিন্তু একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য একটি অঞ্চলের তুলনা কখনই সম্ভব নয়। **পেশেল** তাঁর রচনায় **কান্ট, হুমবোল্ট** ও **রিটারের** আলোচিত আদর্শবাদী চিন্তাধারা সমূলে উৎপাটন করে **বস্তুবাদী দর্শনের** (materialistic philosophy) বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচনাসমূহের মাধ্যমে জন্ম নেয় **ভূমিরূপ বিজ্ঞান** (geomorphology)। কিন্তু **ফ্রোবেল** ও **পেশেলের** একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভূগোলে এক বিতর্কের সূচনা হয়, 'ভৌগোলিক গবেষণায় মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি?'

ফ্রোবেল ও পেশেল

রিটারের ঐতিহ্য ধরে রাখার পুরো কৃতিত্ব সম্ভবত **ফ্রেডরিক র‍্যাটজেল** (Friedrich Ratzel, 1844-1904)-এর। ভূগোলে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য র‍্যাটজেল বক্তব্য রেখেছিলেন। এ কারণে র‍্যাটজেলকে **মানবীয়**